(জ) কোম্পানির দেওয়ানি লাভ : ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে ১৭৬৪ খ্রি.-এর বক্সারের যুদ্ধ এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই যুদ্ধে বাংলা ও অযোধ্যার নবাবদ্বয় শুধু নয় স্বয়ং বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমও পরাস্ত হন। উপর্যুপরি যুদ্ধের ফলে কোম্পানির আর্থিক দুরবস্থাও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বাংলার প্রত্যক্ষ শাসনভার হাতে নেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু বাধা ছিল। সেক্ষেত্রে অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির কাছ থেকে তীব্র বাধার সম্ভাবনা ছিল। অপরদিকে বক্সারের জয়কে সদ্ব্যবহার করারও তাগিদ ছিল। ১৭৬৫ খ্রি.-এর মে মাসে ক্লাইভ ইংল্যান্ড থেকে ফিরে আসেন। কিন্তু ইংরেজশক্তির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ক্লাইভ বাংলার প্রত্যক্ষ শাসনভার গ্রহণের প্রশ্নে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন।

ইতিমধ্যে ১৭৬৫ খ্রি.-এর ফেব্রুয়ারি মাসে মীরজাফরের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র নবাব নজম-উদ্‌দৌলার সঙ্গে কোম্পানি এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। চুক্তিতে বলা হয় নবাব বাংলার নিজামত বা প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকাংশই কোম্পানি-মনোনীত নায়েব নাজিম বা সহ-সুবাদার রেজা খানের হাতে অর্পণ করবে। ফলে বাংলার নবাবকে কার্যত নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত অপর দুই শক্তি বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলম ও অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্‌দৌলার সঙ্গেও ক্লাইভ অনুরূপ চুক্তি সম্পাদনে আগ্রহী ছিলেন যাতে বাংলা থেকে দিল্লি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা যায়। সেই অনুযায়ী ১৭৬৫ খ্রি.-এর ১২ই আগস্ট এলাহাবাদ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে দুটি অংশ ছিল। প্রথমটিতে কারা ও এলাহাবাদ জেলা বাদ দিয়ে নবাব সুজা-উদ্‌দৌলাকে অযোধ্যা রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বিনিময়ে কোম্পানি তাঁর কাছ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা আদায় করে। দ্বিতীয় অংশ অনুসারে দ্বিতীয় শাহ আলমকে কোম্পানি মোগল বাদশাহ হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। বিনিময়ে তিনি কোম্পানিকে বাংলা-বিহার-ওড়িশার দেওয়ানি অর্পণ করেন। কোম্পানি তাঁকে বছরে ২৬ লক্ষ টাকা প্রদানে স্বীকৃত হয়। কারা ও এলাহাবাদ জেলা তাঁকে প্রদাণ করা হয়।

মোগল শাসনকালে সরকারি ক্ষমতাকে দুভাগে ভাগ করা হত—দেওয়ানি ও নিজামত। দেওয়ানির অধীনে ছিল রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানি মামলা; নিজামতের অধীনে ছিল শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার ভার ও ফৌজদারি মামলা। আকবরের সময় দুটি ক্ষমতা দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত থাকত। তাদের নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্যত্র বদলি করা হত। মোগল সাম্রাজ্যের শেষদিকে ক্রমশ দুটি ক্ষমতা এক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। আলিবর্দী খান একাই দুটি ক্ষমতা ভোগ করতেন। ১৭৬৫ খ্রি.-এর দেওয়ানি সনদের অর্থ কোম্পানি বাংলায় মোগল বাদশাহের দেওয়ান হিসাবে কাজ করবে। নিজামত ক্ষমতা নবাবের হাতেই থাকবে। কোম্পানি রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানি বিচারের দায়িত্ব তাদের মনোনীত রেজা খানের হাতে অর্পণ করে; অপরদিকে নবাবও তাঁর নিজামত ক্ষমতা কোম্পানি-মনোনীত একই ব্যক্তিকে (রেজা খান) অর্পণ করেন। অতএব রেজা খান কোম্পানি ও নবাব উভয়ের ক্ষমতাই প্রাপ্ত হন।

ইতিপূর্বেই মীরজাফর ২৪ পরগনা জেলা ও মীরকাশিম বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলা কোম্পানিকে প্রদান করেছেন। নতুন ব্যবস্থায় রেজা খান বাংলার অবশিষ্ট

অংশের নায়েব দেওয়ান নিযুক্ত হন। তিনি যাতে বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠতে না পারেন সেইজন্য রায়দুর্লভ ও জগৎ শেঠকে তাঁর সহযোগী নিযুক্ত করা হয়। মুরশিদাবাদ দরবারে ইংরেজ রেসিডেন্ট ফ্রান্সিস সাইকস তাঁদের ওপর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পান। ইতিহাসে এই ব্যবস্থা দ্বৈত শাসনব্যবস্থা নামে পরিচিত। দ্বৈত এই অর্থে যে আইনত কোম্পানি ও নবাবের মধ্যে দেওয়ানি ও নিজামত ক্ষমতার বিভাজন; বাস্তবে শাসনক্ষমতার বিভাজন ইংরেজ তত্ত্বাবধায়ক ও তাদের ভারতীয় এজেন্টদের মধ্যে। পার্সিভাল স্পিয়ার একে দ্বৈতশাসন না বলে 'পরোক্ষ ব্যবস্থা' নামে অভিহিত করেছেন যা ক্রমশ 'প্রত্যক্ষ ব্যবস্থায়' রূপান্তরিত হয়।

দেওয়ানি লাভ ও তৎপরবর্তী দ্বৈতশাসনের সপক্ষে ক্লাইভ মূলত দুটি যুক্তি দেখিয়েছেন। *প্রথমত*, বাংলার নবাবের সার্বভৌম ক্ষমতার লেশমাত্র রইল না। বাংলার কোশাগারের ওপর তিনি নিয়ন্ত্রণ হারালেন, ইংরেজ-প্রদত্ত বার্ষিক ভাতা নিয়েই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আর্থিক দৈন্যের দরুন ইংরেজবিরোধী বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতাও তাঁর থাকল না। *দ্বিতীয়ত*, বাংলার রাজস্ববাবদ প্রাপ্ত অর্থ কোম্পানির ব্যবসায় বিনিয়োগের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ফলে ইউরোপ থেকে রুপা আনার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়। হেস্টিংস অবশ্য ক্লাইভের এই ব্যবস্থাকে কোনো কৃতিত্ব দিতে রাজি নন। তাঁর মতে বক্সারের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলম কোম্পানির হাতের পুতুলে পরিণত হন। অতএব তাঁর কাছ থেকে দেওয়ানি আদায় করার মধ্যে কোনো কৃতিত্ব নেই। পলাশির যুদ্ধের পর থেকেই নবাবি পদের মর্যাদার ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। ঘটনার স্রোতই কোম্পানিকে দেওয়ানি লাভের দিকে এগিয়ে দেয়। এখানে ব্যক্তিবিশেষের ভূমিকাকে হেস্টিংসগুরুত্ব দিতে নারাজ।

ডডওয়েল দেখিয়েছেন দেওয়ানি লাভের ফলে কোম্পানি ডাইরেক্টরদের প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি। ক্ষমতা থেকে দায়িত্বের পৃথকীকরণের ফল ভালো হয়নি। ডডওয়েল মন্তব্য করেছেন, এই ব্যবস্থা এক বিজয়ী ও নিপুণ বিদেশি সৈনিকের সৃষ্টি। তাঁকে সাহায্য করেছিল একদল ব্যবসায়ী যাদের সুষ্ঠু শাসনকার্য পরিচালনার পেশাগত অভিজ্ঞতা ছিল না। সুষ্ঠু প্রশাসনের চেয়ে বাণিজ্যিক লাভের প্রতি বেশি নজর দেওয়া হয়। সমগ্র ব্যবস্থাটিকে বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন, দেওয়ানি প্রদানের লক্ষ্য ছিল আনুষ্ঠানিক ও প্রকাশ্যে ঘোষিত সাম্রাজ্যজনিত অসুবিধার মধ্যে না গিয়ে কোম্পানির স্বার্থ রক্ষায় বাংলার ওপর যতটা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যায়। ডডওয়েলের মন্তব্যের দ্বিতীয় অংশের সঙ্গে সহমত হলেও প্রথমটি পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় না। কারণ বাংলায় কোম্পানির রাজনৈতিক কর্তৃত্বের চরিত্রের ক্রমপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল।

আসলে জমিদারি প্রথার প্রচলিত বিধিগুলি দেওয়ানি ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। বিনয়ভূষণ চৌধুরী দেখিয়েছেন দেওয়ানি ব্যবস্থায় রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ যে হ্রাস পায় তার কারণ জমিদার ও আমলাদের ওপর দেওয়ানি প্রশাসনের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কোম্পানির কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস কোম্পানির প্রত্যক্ষ শাসনাধীন জেলাগুলির সমৃদ্ধির সঙ্গে দেওয়ানি অন্তর্ভুক্ত জেলাগুলির অর্থনৈতিক অবনতির তুলনা করেছেন। তারা এরজন্য ফৌজদার, আমিল ও শিকদারদের অপশাসনকে দায়ী করেছেন। অধিক পরিমাণ রাজস্ব আদায়ের জন্য কোম্পানি রেজা খানের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। তিনি আবার অধিক রাজস্বের জন্য আমিলদের মাধ্যমে জমিদারদের ওপর ক্রমাগত চাপ দিতে থাকলে তাদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে।

ফার্মিঙ্গারের মতে দেওয়ানি লাভ সত্ত্বেও কোম্পানির প্রত্যক্ষ প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণে অনীহার কারণ ছিল কোম্পানি কর্মচারীদের এদেশের ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা। বিনয়ভূষণ চৌধুরী অবশ্য অজ্ঞতাকে একমাত্র কারণ বলে মনে করেন না। তাঁর মতে, কোম্পানি মনে করেছিল আলোচ্য সময়ে ভূমি-রাজস্ব আদায়ের অবস্থা ভালো ছিল না ও এই দায়িত্ব গ্রহণে যে ঝক্কি পোহাতে হত তার কোনো প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কোম্পানি তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে। কারণ দেওয়ানি ব্যবস্থার দোষত্রুটিগুলি ক্রমশই প্রকট হয়ে উঠছিল। ১৭৬৯ খ্রি.-এর মে মাসে মুরশিদাবাদে কোম্পানির রেসিডেন্ট রিচার্ড বেচার মন্তব্য করেছেন, কোম্পানির দেওয়ানি প্রাপ্তির পর দেশের মানুষের অবস্থার পূর্বের চেয়ে অবনতি হয়েছে। ১৭৬৯ খ্রি.-এই বাংলার গভর্নর ভেরেলস্টের অধীনে দেওয়ানির স্থলে 'সুপারভাইজারশিপ' ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থাও কিছুদিনের মধ্যেই ব্যর্থ ও প্রত্যাহৃত হয়। ১৭৭০ খ্রি.-এর দুর্ভিক্ষের পর সব মহল থেকে দেওয়ানি ব্যবস্থার বিরূপ সমালোচনা হয়। ফলে ১৭৭১ খ্রি.-এর আগস্টে কোম্পানি দেওয়ানির প্রত্যক্ষ দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেয়। রাজস্ব আদায়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব এখন থেকে কোম্পানির কর্মচারীদের হাতে ন্যস্ত হয়।

দেওয়ানি লাভের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পিটার মার্শাল একে 'উপসাম্রাজ্যবাদ' আখ্যা দিয়েছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন দেওয়ানি লাভকে মোগল ও ব্রিটিশ বাংলার বিভাজনরেখা বলে মনে হবে। বস্তুত বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের ফলে কোম্পানি বাংলায় যে 'প্রকৃত' ক্ষমতার অধিকারী হয় দেওয়ানি লাভে তা 'আইনসঙ্গত' ক্ষমতায় রূপান্তরিত হয়। বাংলায় ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারে পলাশির যুদ্ধ যদি প্রথম ও মীরজাফরের পতন যদি দ্বিতীয় পর্ব হয় তাহলে দেওয়ানি লাভ তৃতীয় বা শেষপর্ব।

(ঝ) দেওয়ানি লাভের ফলাফল : দেওয়ানি লাভের ফলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার চূড়ান্ত অবনতি ঘটে। কোম্পানি রাজস্বের দাবি বহুগুণ বৃদ্ধি করে। রেজা খান রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব আমিলদের ওপর ছেড়ে দিলে তারা সর্বোচ্চ রাজস্ব প্রদানে স্বীকৃত জমিদারদের রাজস্বের ইজারা দিত। ফলে কৃষিব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায়। ইংরেজ কালেক্টর বা সুপারভাইজার নিযুক্ত করেও ফল পাওয়া যায়নি। দেশীয় বণিক, কারিগর ও শিল্পীদের দুর্দশাও বৃদ্ধি পায়। ইংরেজ ও তাদের পেটোয়া বণিকদের বিনাশুল্কে অবাধ বাণিজ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তারা পিছু হটে। কোম্পানির বাণিজ্য নীতির ফলে বাংলার সুতি ও রেশম শিল্প ধ্বংস হতে থাকে। উইলিয়াম বোল্ট ১৭৭২ খ্রি.-এ লিখিত এক প্রতিবেদনে কোম্পানির এজেন্ট ও গোমস্তারা কেমন করে তাঁতিদের ওপর অত্যাচার করত তার বিবরণ দিয়েছেন। বাংলার তাঁতিদের কীভাবে নিম্নতম মূল্যে বস্ত্র বিক্রি করতে বাধ্য করা হত তার আলোচনা আমরা ঐতিহাসিক নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহের গবেষণা থেকে জানতে পারি। কোম্পানি কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যও অবাধে চলতে থাকে। শুরু হয় 'পলাশির লুণ্ঠন'। ভারতের সম্পদের বহির্গমন ঘটতে থাকে। অনেকে মনে করেন বাংলার লুণ্ঠিত সম্পদই ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের মূলধন সৃষ্টি করে। দেওয়ানি ও দ্বৈত শাসনের পরিণাম ছিল ১৭৭০ খ্রি.-এর (বাংলা সন ১১৭৬) ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ যা ইতিহাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। যথেচ্ছ রাজস্ব আদায় ও অবাধ লুণ্ঠনের ফলে বাংলার গ্রামীণ জীবন ও কৃষি-অর্থনীতি ধ্বংস হয়।

(ঞ) দেওয়ানি ব্যবস্থার প্রকৃতি : মোগল বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলম কর্তৃক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দেওয়ানি প্রদান চিরাচরিত মোগল ব্যবস্থার সঙ্গে কতটা সংগতিপূর্ণ,

এ নিয়ে বিতর্ক আছে। আপাতদৃষ্টিতে এটি সংগতিপূর্ণ বলে মনে হতে পারে। কারণ আকবরের শাসনকাল থেকেই দেওয়ানি ও নিজামতের দায়িত্ব দুই পৃথক ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত হত। একটি মোগল সুবার দেওয়ানি অর্থাৎ রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানি মামলার বিচারের দায়িত্ব ছিল দেওয়ান এবং সুবার নিজামত অর্থাৎ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও ফৌজদারি মামলার তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকত সুবাদার। উভয়কেই অন্যত্র বদলি করা হত। আওরঙ্গজেবের শাসনকালের শেষদিকে মোগল শাসনব্যবস্থায় শৈথিল্য দেখা দিলে দুটি দায়িত্ব একই ব্যাক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হয় ও বদলি প্রথাও বন্ধ হয়ে যায়। যেমন, বাংলার দেওয়ান মুর্শিদকুলি খান সুবাদার আজিম উস-শানকে ক্ষমতাচ্যুত করে স্বয়ং বাংলার দেওয়ানি ও নিজামত ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। অতএব কোম্পানির দেওয়ানি লাভ চিরাচরিত মোগল ব্যবস্থার বিরোধী ছিল না। যদিও এই ব্যবস্থাটি পরবর্তীকালে মানা হয়নি।

কিন্তু অন্যদিক থেকে দেখলে দ্বিতীয় শাহ আলমের দেওয়ানি ফারমানকে মোগল ব্যবস্থা থেকে বিচ্যুতি বলেই মনে হবে। কারণ দেওয়ানি লাভের পূর্বেই কোম্পানি বাংলার নবাব নজম-উদ্‌দৌলাকে নিজামত অর্থাৎ তাঁর প্রশাসনিক ক্ষমতা কোম্পানি-মনোনীত রেজা খানকে হস্তান্তর করতে বাধ্য করেছিল। ফলে দেওয়ানি ও নিজামত লাভের পর উভয়ক্ষমতাই কোম্পানির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। মোগল ব্যবস্থা অনুসারে দেওয়ান কখনই সুবার প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করত না। কিন্তু ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে নবাব বাংলার প্রতিরক্ষার দায়িত্ব কোম্পানির হাতেই তুলে দেন। সবশেষে, দেওয়ানির দায়িত্ব কোনো ব্যক্তিবিশেষকে প্রদান না করে একটি বিদেশি কোম্পানির হাতে অর্পিত হয়। ইতিপূর্বে এ ধরনের ঘটনা কখনো ঘটেনি।